ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও আফ্রিকার প্রতিক্রিয়া

এলহাম হোসেন

ইউরোপীয়রা আফ্রিকাকে দেখেছে 'কৃষ্ণ চশমা' দিয়ে। আর বাঁকি বিশ্বও এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আফ্রিকার যে রূপ দেখেছে তা-ও কৃষ্ণ বা কালো। প্রায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তই তো আফ্রিকার সাথে বাকি বিশ্বের শুধুমাত্র কূটনৈতিক সম্পর্কই চলছিল। আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয়নি। এর জন্য ঔপনিবেশিক মানসিকতাই অনেকাংশে দায়ী। আফ্রিকী সাহিত্যের লৈখিক রূপ প্রাচীন নয়, নবীণ। কিন্তু এর মৌখিক সাহিত্যের অসাধারণ প্রাচীনত্ব, গভীরতা, জীবন ঘনিষ্ঠতা, দার্শিনিকতা, কাব্যিক ব্যঞ্জনা, রূপ-কল্পতা ও বৈদগ্ধতা বিশ্বের যেকোন প্রান্তের সাহিত্য-পাঠককে মুগ্ধ করে, চমৎকৃত করে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই, এমনকি আফ্রিকার দেশসমূহেও আফ্রিকী সাহিত্য পাঠ উল্লেখযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। এমনকি বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রায় সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তই আফ্রিকী সাহিত্য প্রায় অবহেলিত ছিল, রয়েও গেছে অনেকটা। আফ্রিকী সাহিত্যের এই অবহেলিত অবস্থার জন্য ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও ঔপনিবেশিকদের সুক্ষ রাজনীতিই দায়ী।

রাজনীতিতে পক্ষ থাকে, বিপক্ষও থাকে। এখানেও তাই। ঔপনিবেশিকরা পক্ষ আর আফ্রিকা বিপক্ষ। ঔপনিবেশিকদের ক্ষমতা চর্চার সব উপসঙ্গই আছে। সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জাহাজ আছে, যুদ্ধ করার ঘোড়া আছে, ঢাল-তলোয়ার, বন্দুকও আছে। তাঁদের ভাষা আছে। যুদ্ধ জয় করার কাহিনী ও একপাক্ষিক গৌরবগাঁথা লেখার জন্য বর্ণমালাও আছে। অপরপক্ষে আফ্রিকীদের ভাষা আছে কিন্তু বর্ণমালা নাই। সাহিত্য আছে। মৌখিক, লৈখিক নয়। আফ্রিকায় প্রথম মানব 'জিনজান থ্রপাস' এর জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষিকাজের উদ্ভবও এখানে। কিন্তু এর নৃতাত্ত্বিক সমৃদ্ধির ইতিহাস লেখার বর্ণমালার উপস্থিতি নেই আফ্রিকী ভাষায়। কাজেই আফ্রিকাকে নিয়ে ইউরোপীয়রা নিজেদের মতো করে বয়ান তৈরি করে। এটি ঔপনিবেশিক-রাজনৈতিক বয়ান যার বাহক হিসেবে ঔপনিবেশিকদেরই সাহিত্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনীতিচর্চার স্থান শুধু মাঠ-ময়দান বা রাজপথ নয়, সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রও রাজনীতির লালন, পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্দীপনা সরবরাহ করে থাকে। এই সাহিত্যকে পশ্চিমারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছে মূলত ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে আফ্রিকাকে অংকন করতে গিয়ে। এই রাজনীতি আফ্রিকাকে নেতিবাচক চিত্রকল্প দিয়ে প্রকাশ ও উপস্থাপন করার; এই রাজনীতি আফ্রিকায় পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানোর ইতিহাসকে জায়েজ করার জন্য; এই রাজনীতি আফ্রিকার মাটিতে 'নীতি' বিসর্জন দিয়ে শুধু 'রাজ' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য। এমনকি উত্তর-ঔপনিবেশিককালেও, নয়া-ঔপনিবেশিকতার যুগেও। এই 'রাজ' জেঁকে বসে আছে স্থানীয়দের মনস্তত্ত্বের অনেকটা জুড়েই।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝিতে ইউরোপ যখন আফ্রিকায় ঢুকে পড়েছে তখন আফ্রিকা ছিল সম্পূর্ণরূপেই সমাজতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্ভর। তবে সামগ্রীকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত স্থানীয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস, লৌকিকতা, ধর্মীয় আচার ও ভাষায় ছিল একে অপর থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি ছিল জমি, আরও ভালো করে বলতে গেলে, কৃষিজ জমি, যার মালিক ছিল গোত্র প্রধান, সাধারণ প্রজারা নয়। গোত্রে বিবাদ ছিল, ছিল দাস-প্রথাও। কিন্তু দাস-ব্যবসায় ছিল না। অপরপক্ষে, ইউরোপ যতদিনে আফ্রিকায় পৌঁছে ততদিনে এটি রেনেসাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বণিকে পরিণত হয়েছে। এটি ছুটতে শুরু করেছে পুঁজির পেছনে, পুঁজিকে বহুগুণে বাড়ানোর

প্রতিযোগিতায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের দেশে কল-কারখানা স্থাপন করল। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হলো জনবলের। এছাড়া বিশেষ করে আমেরিকার উর্বর মাটি যা তখনও ব্রিটিশদের উপনিবেশ, সেখানে ফসল ফলানোর জন্যও প্রয়োজন হলো প্রচুর জনবলের। এরা আফ্রিকায় এসে দেখল যে, দাস-প্রথা তো এখানে রয়েই গেছে, এখন শুধু শুরু করার দরকার দাস-ব্যবসায়। তাই অচিরেই এটিও শুরু হয়ে গেল। মদ, বন্দুক, ঘোড়ার বিনিময়ে তারা সংগ্রহ করতে লাগল অসংখ্য দাস-দাসী। কখনওবা ছলে আবার কখনও বলেও, খুন-ডাকাতি করেও দাস-দাসী সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে থাকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ও শহরে। নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে আদায় করা হয় শ্রম। বেশীরভাগ দাস-দাসী পাঁচ বছরের বেশী বাঁচত না। শারীরিক নিপীড়ন, রোগ, ক্ষুধা, অপুষ্টি ও নানান প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাই ছিল এর জন্য দায়ী। লন্ডন, আমস্টারডাম ও নিউইয়র্কের মত চকচকে শহরগুলো গড়ে ওঠে অসংখ্য আফ্রিকী দাস-দাসীর শ্রম, রক্ত, ঘাম ও প্রাণের বিনিময়ে। অপরদিকে, আফ্রিকার স্থানীয় নেতারা তাদের নিজেদের সবল, সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যবান নারী-পুরুষদের দাস-দাসী হিসেবে ঔপনিবেশিকদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে নিজেদের দেশকে শ্রম-শুন্য দেশে পরিণত করে। ফলে, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করেনা। ঠিক এমনি অবস্থায় ইউরোপীয়রা ভূমিকা গ্রহণ করে স্বঘোষিত পরিত্রাতার। তারা এক রাজনীতির প্রশ্রয় নেয়। এই রাজনীতি আফ্রিকাকে 'অন্ধকার মহাদেশ' বলে প্রচার করার রাজনীতি; এই রাজনীতি আফ্রিকাকে ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা ও ধর্ম বিবর্জিত মহাদেশ বলে উপস্থাপনার রাজনীতি; এই রাজনীতি আফ্রিকার উপর ইউরোপের প্রভূত্ব, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম-বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি। এতে ইউরোপ বিরাট সফলতাও অর্জন করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয়রা আফ্রিকা বলতে যাকে বুঝায় তা ছিল আফ্রিকার বহিরাঙ্গ মাত্র। এরা আফ্রিকীদের ভাষাও জানত না। তাই মিথস্ক্রিয়াও সম্ভব হয়নি। আফ্রিকীরা কি ভাবছে, কি করছে, কেন করছে এতটুকু জানার জন্য প্রশ্ন করার ভাষা-জ্ঞানও ছিলনা ইউরোপীয় পরিব্রাজক, বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের। তাদের এই অপরাগতাকে আড়াল করতে আফ্রিকাকে উপস্থাপন করলো এক অদ্ভূত জাতি হিসেবে যার ভাষা নেই, মস্তক নেই – "মুখ আর চোখ রয়েছে বুকে"।

১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা ও তাঁর নাবিক সহযাত্রীরা যখন উত্তর আটলান্টিক ও উত্তমাশা অন্তরীপ পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের 'দীর্ঘ পাথুরে' শহরগুলোতে পৌঁছেন তখন তো বিস্ময়ে তাদের চোখ চরকগাছ। তাঁরা জেনে অভিভূত হলেন যে, এখানকার নাগরিকগণ তাঁদের মতই নৌ-চালনা, জলপথ ও দিক নির্ণায়ক যন্ত্র সম্বন্ধে জানেন। আর লোকজনও এতটাই সভ্যও যে, বরং ভাস্কোদা গামা ও তাঁর সহচরদেরকেই এরা অসভ্য-বর্বর মনে করে ভর্ৎসনা করে। ঠিক প্রায় একই সময়ে রোমের পোপ দশম লিও এক বন্দী মূরের কাছে টিম্বাকতুর কিংবদন্তি নগরীর কথা শোনেন ও বিস্মিত হন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এ নগর ঈর্ষণীয় উচ্চতায় অবস্থান করছিল। এখানকার পন্ডিতরা এত-এত বই পড়ত যে, ইউরোপীয় বণিকরা এখানে বই-বাণিজ্য করতেও প্রলুব্ধ হয়েছিল। হল্যান্ডের নাবিকরা যারা নাইজেরীয় রেইন ফরেস্ট পার হয়ে বেনিন নগরীতে পৌছে তারা এর প্রশস্ত রাস্তাঘাটকে আমষ্টারডামের রাস্তাঘাটের সাথে তুলনা করেছে। এখানকার রাজপ্রাসাদ হারলেম শহরের রাজপ্রসাাদের মতই প্রশস্ত। কিন্তু এতসব সমৃদ্ধির কথা ইউরোপীয়রা সঠিকভাবে উপস্থাপন যে করেছে - তা নয়। তারা আফ্রিকার অভ্যন্তরে খুব কমই প্রবেশ করেছে আর যা দেখেছে তা হলো আফ্রিকার সমৃদ্ধির ঝলকমাত্র। তাই তা দিয়ে মিথ রচনা করেছে নিজেদের ফোকলোরে ও সাহিত্যে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে কালো মানুষদের মুক্তির সংগ্রামকে তো নৈরাজ্য ও সাদাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। শেক্সপীয়ারের ক্যালিবানকে তো মানুষের অবয়বই দেওয়া হয়নি। আর ডেনিয়েল ডেফোর ফ্রাইডে তো ক্রুসোর চাপিয়ে দেওয়া নামেই পরিচিত। সে ক্রুসোর ভাষা শেখে, তার বাইবেল রপ্ত করে আর তার প্রাণের মালিকও ভাবে ক্রুসোকে।

যখন ক্রুসো তার বন্দুক দিয়ে ফ্রাইডের প্রাণ বাঁচায় নরখাদকদের হাত থেকে তখন তো ফ্রাইডে যেভাবে ক্রুসোর পদযুগল চুম্বন করছিল তাতে সাদা-কালো বা ইউরোপীয়-আফ্রিকীর ভেদ বা প্রভেদ খুব স্পষ্টই চোখে পড়ে। ফ্রাইডেকে যেন নিতেই হবে ক্রুসোর দেওয়া নাম। তার নিজের ভাষা নিশ্চয় একটা ছিল কিন্তু তা তাকে ছাড়তে হবে ক্রুসোর ভাষার কাছে। কন্‌রাডের *হার্ট অব ডার্কনেস* উপন্যাসে আমরা কালোদের মানবেতর দাসত্বের কাহিনী শুনি সাদা চামড়ার মারলোর মুখ থেকে। কুর্টজ তো কালোদের হত্যা করে তাদেরই মাথার খুলি দিয়ে ভয়ঙ্কর সুন্দরভাবে তার কটেজের চারপাশ সাজিয়েছে। কায়েম করেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব সভ্যতার আলো ছাড়াতে এসে এই কঙ্গোর অভ্যন্তরে।

ইউরোপীয়ানরা তাঁদের সাহিত্যে তৈরি করেছেন এক বয়ান তাঁদের বাইরের মানুষদের নিয়ে, আফ্রিকাকে নিয়ে। এই বয়ান অনেকাংশেই দুরভিসন্ধিমূলক। আফ্রিকাকে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, করা হয়েছে বিকৃতভাবে উপস্থাপনও। সেখানে আফ্রিকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অন্ধকার মহাদেশ হিসেবে যেখানে শুধু ক্ষুধা, অসভ্যতা, অপুষ্টি, ইতিহাসহীনতা আর ম্যালেরিয়ার বসবাস। এই বয়ান কোন প্রতি-বয়ান মানে না কারণ পশ্চিমা সংস্কৃতি নিজেদের পরম শ্রেষ্ঠত্বের আশে-পাশে আর কাউকেই বা কোন কিছুকেই আসতে দেয় না। এ কারণে বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ আফ্রিকাকে জেনেছে ইউরোপীয় বয়ানের মধ্য দিয়ে। যার ফলে, অবশ্যাম্ভাবীভাবেই যা হবার তাই হয়েছে। আফ্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা, জানার অজ্ঞতা এবং আফ্রিকার অন্তরে প্রবেশ করার অসামর্থ্যই পাঠককে বলতে বাধ্য করেছে যে, আফ্রিকা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। আসলে, এ অন্ধকার আফ্রিকার বাইরের ও ইউরোপীয়দের আফ্রিকাকে জানার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার অন্ধকার। আফ্রিকা যে একটি যাদুঘরের মতো, যা বহু গোত্র, উপজাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আঁকড় তা ইউরোপীয়দের কাছে অধরা রয়ে গেছে। এটি তাঁদের সীমাবদ্ধতা, আফ্রিকার নয়। শুধু নাইজেরিয়াতেই দুইশত পঞ্চাশের বেশী উপজাতির বসবাস। এদের প্রত্যেকের আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও দেব-দেবী। এক এক গোত্রের এক এক রীতি, ভিন্ন ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা ও বিশ্বাস-ব্যবস্থা। নীতিবোধ চর্চার ব্যাপারে এরা অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ইউরোপীয়রা একে সংস্কৃতি-সভ্যতা বা ভাষা বলেনা। একজন আফ্রিকী যদি তার নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ত্যাগ করে ইউরোপীয় ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তবেই তাকে সভ্য বলা হয়, অন্যথা নয়। অর্থাৎ, সভ্য হওয়ার জন্য একজন আফ্রিকীকে তার পরিচয় ত্যাগ করতে হবে, ছাড়তে হবে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা। প্রদর্শন করতে হবে প্রশ্নাতীত আনুগত্য। শুধু তাই নয়-সভ্য হতে আফ্রিকীদের ইউরোপীয়দের ধর্মও গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান কাজ করতো মিশনারীগণ, তাই শিক্ষালাভের অন্যতম প্রবেশদ্বারে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হতো। স্থানীয়রা গ্রহণ করলো বাইবেল আর বহিরাগত ঔপনিবেশিকরা লাভ করলো স্থানীয়দের ভূমির মালিকানা। ধর্ম, ধার্মিকতা ও সভ্যতা প্রচারের অজুহাতে চলতে থাকলো ঔপনিবেশিক আধিপত্যচর্চা, স্থানীয়দের ঠেলে দেওয়া হলো বৃত্তের পরিধির দিকে আর ঔপনিবেশিকরা দখল করল কেন্দ্র - ক্ষমতার কেন্দ্র, আধিপত্যের কেন্দ্র। আর এই ঔপনিবেশিক আধিপত্য চর্চাকে জায়েজ করার জন্য শুরু হলো স্থানীয়দের পরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকৃতি, অপব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য সব কদার্যতায় মন্ডিতকরণের তৎপরতা। ঔপনিবেশিকরা দাবী করল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব আর এর অপরপক্ষে আফ্রিকাকে উপস্থাপন করা হলো এর বৈপরীত্যে বা বাইনারী অপজিশনে।

ঔপনিবেশিকরা সবসময়ই আফ্রিকাকে দেখেছে আফ্রিকার বাইরে থেকে। আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, বৈচিত্র, সংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, শিল্পকলা, নৃতাত্ত্বিক মূল্য ও মূল্যবোধের কোনকিছুই ঔপনিবেশেকরা দেখেনি, দেখতে চায়নি। এখানেও আছে তাঁদের রাজনীতি। এই রাজনীতির চর্চা ঔপনিবেশিক সাহিত্যিকরাও করেছেন। অনেক ঔপনিবেশিক উপন্যাসে কৃষ্ণাঙ্গদের অপ্রধান চরিত্র হিসেবেই দেখা যায়। এরা হয় চাকর, না হয় কৃতদাস, না হয় কোন হাস্যোদ্দীপক রসালো চরিত্র। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কৃষ্ণাঙ্গকে দেখা যায় না। শেক্সপীয়ারের অথেলো প্রধান চরিত্র হলেও তাকে প্রথম দৃশ্যে রোডারিগো ব্রাবানশিওর জানালার

নীচে দাঁড়িয়ে যেভাবে উপস্থাপন করে তাতে ইউরোপীয়দের সাদা চামড়ার, আর চিকন বা সুক্ষবুদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, অথেলোকে ইয়াগো 'ঠোঁট মোটা গাধা' হিসেবে উল্লেখ করতে ভোলেনি। সাদা আর কালো যে মেশে না- তাও ইয়াগো বলতে ভোলেনি। অথেলো আর ডেসডিমোনার যে সন্তানের জন্ম হবে তা মানব সন্তান হবে না - হবে 'দু পীঠ বিশিষ্ট জন্তু।' শেকস্পীয়রের সমসাময়িক ও বন্ধু বেন জনসন প্রায় ৬০টির মত masque বা মুখোশ নাটক লেখেন। তাঁর *Masque of Blackness* মুখোশ নাটকের গল্পটা এরকম - এক নিগ্রো পিতার বারজন কন্যা। কন্যারা প্রথমদিকে সুখেই ছিল। কিন্তু যখন তারা জানলো যে, দূরে একদেশ (ইংল্যান্ড) আছে যেখানকার মানুষদের চামড়া সাদা তখন তাদের সব সুখ উবে গেল। তাদের বাবাকে চাপাচাপি করতে লাগল। তারা আশায় বুক বাঁধল যে, তারা যাত্রা করবে সেই ব্রিটানিয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে সূর্য তাদের চামড়াকে ঝলসে দেবে না। তাদের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হবে সাদাময়তায়। জনসন অবশ্য তাঁর পরবর্তী মুখোশ–নাটক *Masque of Beauty* তে এই বার কন্যার রূপের ঝলক তুলে ধরেছেন। এরা ব্রিটানিয়াতে এসে কালোকে ধুয়ে ফেলেছে আর তাই কৃতজ্ঞতায় ব্রিটানিয়ার স্তুতি করছে।

একথা সত্য, যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই থাকে একটি প্রতিক্রিয়া। শত শত বছর ধরে ঔপনিবেশিকরা তাদের সাহিত্যে যেভাবে আফ্রিকাকে বিকৃত করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় স্বয়ং আফ্রিকী সাহিত্যিকরাই একটি জোরালো প্রতিবয়ান তৈরি করেছে তাদের নিজেদের সাহিত্যে–তা আবার অনেকাংশে ঔপনিবেশিকদের ভাষাই ব্যবহার করে। পশ্চিমা শিক্ষা, ভাষা ও চিন্তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পর আফ্রিকীরা, শুধু যে আফ্রিকার মাটিতে বসবাসকারী আফ্রিকী তা নয়, সুদূর আমেরিকাতে বসবাসকারী কৃষ্ণাঙ্গরাও বোধ করেছে যে, তাদের নিজেদের কাহিনী নিজেদেরই বলতে হবে। ১৯২০ এর দশকে এই বোধ রেনেসাঁর রূপ নেয় হারলেমএ। ১৯৩০ আর ৪০ এর দশকে ফ্রান্সের প্যারিসে নেগ্রিচুড আন্দোলনতো এই বোধেরই উত্থানপর্ব। তারই ধারাবাহিকতায় আবির্ভাব ঘটে অ্যামে সিজেয়ার, স্যাঁগর, বুচি অ্যামশেতা, ওলে সোয়িংকা, নগুগি, আচেবে, নুরুদ্দিন ফারাহ, সেমবেন উসমান, আমা আটা আইডু, এলেচি আমাদি প্রমুখ রাজনীতি সচেতন লেখক ও সাহিত্যিকের। হারলেম রেনেসাঁর দুই মুখপাত্র - অ্যাফ্রো-আমেরিকান ক্লদ ম্যাকে ও ল্যাংসটন হিউয়েজ বেশ জোরালোভাবেই তৈরি করেছেন কালো মানুষদের ভাবাবেগ, ভাষা, ভাবনা ও ভাবনার বিষয়বস্তু প্রকাশের ভিত্তি। ফলশ্রুতিতে প্যারিসে সিজেয়ার, ডামাস, স্যাঁগর অনুপ্রেরণা গ্রহণ করলেন এঁদের কাছ থেকে। তাঁরা নেগ্রিচুড আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। লক্ষ একটাই–ফরাসি ভাষায় তাঁদের শিকড়ের অণ্বেষণ ও বিশ্বের দরবারে তার উপস্থাপন। ঔপনিবেশিকরা দাস ব্যবসার মধ্য দিয়ে আফ্রিকীদের শিকড় থেকে উপড়ে নিয়ে গেছে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার নানা প্রান্তে। কিন্তু মনের গভীরে রয়ে গেছে শিকড়-ছিন্ন হওয়ার তীব্র যাতনা, গভীর হাহাকার। তাই, হারলেম রেনেসাঁ ও নেগ্রিচুড আন্দোলন যখন আফ্রিকীদের আত্মপ্রকাশের ভাষা ও ধরণ শিখতে উদ্বুদ্ধ করলো তখন এরা এক সৃষ্টির ও আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠল। এই সৃষ্টি হলো তাদের নিজেদের জন্য একটা মজবুত ভিত্তির আর এই আবিষ্কার হলো তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আবিষ্কার যা বহু শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিকদের বিকৃত উপস্থাপনা ও দুরভিসন্ধিমূলক রাজনীতির জগদ্দল পাথরে চাপা পড়েছিল। এই সৃষ্টি আর আবিষ্কারের নেশা তাদেরকে রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করে তোলে, সাহসী করে তোলে বিপ্লবের বাণী উচ্চারণের ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে। রাজনৈতিকভাবে দেখলে বুঝা যায়, হারলেম রেনেসাঁ ও নেগ্রিচুড আন্দোলন শুধুই সাহিত্য-আন্দোলন নয় - এগুলো পরবর্তীতে আফ্রিকার দেশসমূহে স্বাধীনতা আন্দোলনেরও রসদ সরবরাহ করে। উদ্দীপিত করে নিজেদের জাতিয়তাবাদ গঠনে।

একথা সত্য, আফ্রিকী সাহিত্য ও রাজনৈতিক বয়ান একই সুতায় বাধা। এই দু-ই এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। দিওপ, ফানো, নগুগি, সয়িঙকা, আচেবে, চিনওয়েজু প্রমুখ লেখকের লেখায় এই দু'য়ের অনবদ্য সমন্বয়ই দেখা

যায়। উপরন্তু, তাঁরা তাঁদের লেখার প্রেক্ষিত হিসেবে শুধু স্থানীয়কেই ব্যবহার করেননি, আন্তর্জাতিকতাকেও আলিঙ্গন করেছেন এবং এভাবে এঁরা শুধু সাহিত্য নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বয়ানও তৈরি করেছেন। তা-ও আবার করেছেন ঔপনিবেশিকদের ভাষাতেই। উপস্থাপন করেছেন এক জোরালো প্রতি-বয়ান। জয়েস ক্যারি তাঁর *মিস্টার-জনসন* এ আফ্রিকীদের যে হাস্য-রসাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক **ভঙ্গিতে** উপস্থাপনা করেন তার প্রতি-বয়ান হিসেবে আচেবের উপন্যাসগুলো আফ্রিকার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বকীয়তা অংকন করে।

আফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে আফ্রিকারই ইতিহাস-সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে আচেবের উপন্যাসগুলো বাস্তব ও ঐতিহাসিক রসে সঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো পশ্চিমা সমালোচক আচেবের ইতিহাস নির্ভরতাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা যদি বুঝতে পারি যে, আচেবে পশ্চিমাদের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় কলম ধরেছেন তাহলে এটিকে সহজভাবে মেনে নেয়া যায়। এই অভিযোগ হলো, আফ্রিকার নাই নিজস্ব ইতিহাস, নাই কোন সাংস্কৃতিক পরিচয়। এই অভিযোগ খন্ডন করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আচেবে পশ্চিমাদেরই ভাষা ব্যবহার করেছেন, যদিও সেই ভাষার বুননের মধ্যে সচেতনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইগবো ভাষার শব্দ, প্রবচন ও দেবদেবীর নাম। এ যেন বিশ্বায়ন ও সংকরায়নের যুগে সকল ঐতিহ্যের সফল উত্তরাধিকারী হওয়ারই প্রয়াস। একা থাকতে গিয়ে যদি ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তো দম বন্ধ হয়ে নিজেরই মৃত্যু ঘটবে। তার চাইতে বরং ঘরের সব দরজা-জানালা খুলে দিয়ে প্রশস্ত দিগন্তে দৃষ্টি বিস্তৃত করে বৈচিত্র্যময় জগৎকে অবলোকন করলেই তো নিজেকে বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন **করা** সম্ভব। সময়ের দাবি তো এটাই।

আফ্রিকী সাহিত্যের অপর দিকপাল ওলে সোয়িঙকাও পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্য কর্মে–নাটকে, উপন্যাসে। নিজ সংস্কৃতিকে বর্জন করে শুধু তথাকথিত সভ্য হওয়ার অজুহাতে পশ্চিমা ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবনার অন্ধ অনুকরণ যে স্থানীয়দের নকল বা মেকি মানুষ বা মিমিক ম্যান-এ পরিণত করতে পারে-তারই শক্তিশালী চিত্র দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান নাটক *The Lion and the Jewel* এ লাকুনলের চরিত্রের মধ্যে। লাকুনলে যেন বুঝতেই চায় না যে, শরীরের স্বাভাবিক মাপের চেয়ে ছোট স্যুট পড়লেই তথাকথিত স্মার্ট হওয়া যায় না। পশ্চিমা ভদ্রলোক হওয়ার নেশায় সে যেভাবে স্থানীয় সংস্কৃতিকে অসভ্যতা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে তাতে তার ব্যাঙ্গাত্মক রূপই ফুটে উঠেছে। একথা সত্য, Absence কিন্তু Non-existence নয়। নাইজেরীয়দের ইংরেজি ভাষা নেই, স্যুট নেই, চকচকে পশ্চিমা জুতাও তারা পরে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের নিজস্ব ভাষা নেই, নিজেদের মতো করে তৈরি করা পোশাক নেই বা সংস্কার নেই। ওলে সয়িঙকা নাইজেরীয়দের এই আপন সংস্কৃতির চিত্রই তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে তার লেখনির মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে অংকন করেছেন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এবং তাঁর চরিত্রকে ব্যক্তি খোলসের বাইরে বের করে এনে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন- যে মানুষ আপন সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়েও বিশ্ব-নাগরিক হয়ে উঠবে। একইভাবে কেনীয় লেখক নগুগি যদিও ইংরেজি সাহিত্যেই স্নাতক এবং প্রথমদিকে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা শুরু করেন, পরবর্তীদের ফিরে আসেন গিকুয়ু ভাষায়। এমনকি ঔপনিবেশিকদের দেওয়া নাম জেম্‌স নগুগি পরিবর্তন করে স্বদেশী নাম নগুগি ওয়াথিয়োঙ্গ ব্যবহার করেন। খৃষ্টধর্মও ত্যাগ করেন। তাঁর লেখায় নগুগি কেনিয়ার অন্তরে প্রবেশ করেন, তুলে আনেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিকৃতির চিত্র। ঔপনিবেশিকতার ভূত দেশ ছেড়ে চলে গেলেও এখনও যে তার আছড় রয়ে গেছে বুর্জোয়া–পুঁজিপতিদের উপর যারা দেশের শাসনযন্ত্রের কলকাঠি নাড়ে–**সেই** চিত্রই নগুগি তাঁর **উপন্যাসের** পাতায় জীবন্ত করে তুলেছেন কখনও রূপকল্প আবার কখনও পরোক্ষ উপমা ব্যবহার করে। তাঁর নয়া-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষের মনস্তত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাঁর লেখাকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক বয়ানের এক মজবুত প্রতিবয়ান

হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাঁর *Petals of Blood* ও *Wizard of the Crow* হলো বিখ্যাত দুটো উপন্যাস যেখানে তিনি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক কেনিয়ার তথা গোটা আফ্রিকার সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও আত্ম-পরিচয় বিভ্রাটের জটিল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সেনেগালীয় লেখক ও চলচ্চিত্রকার স্যমবেন উসমানও তাঁর *স্বালা* উপন্যাসে উত্তর-ঔপনিবেশিক **সময়ে** স্থানীয়দের একটি শ্রেণি কিভাবে ঔপনিবেশিকদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে আত্মপরিচয় বিসর্জন দেয় তারই চিত্র অংকন করেছেন।

লিওপোল্ড সেদার স্যাঁগর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান সেনেগালীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ। ফরাসী সংস্কৃতির দৌরাত্মের প্রতিক্রিয়ায় স্যাঁগর ইতিহাস ভিত্তিক গবেষণা করে দেখান যে, আফ্রিকী সংস্কৃতির এক শিকড়গত নিবিড় সম্পর্ক আছে মিশরীয় ও গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে যা ইউরোপীয় সংস্কৃতিরও উৎস। নেগ্রিচুড আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই আন্দোলন সাদাদের একেবারে পরিত্যাগ করার জন্য নয়, বরং এটি সাদাদের সাথে কালোদের ডায়ালগ বা মিথস্ক্রিয়ার দাবী নিয়ে হাজির হয় বিশ্বদরবারে। এই আন্দোলনের সহযোদ্ধা গায়ানার ডামাস, তাঁর কবিতায় আফ্রিকায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির আধিপত্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন। আর মার্টিনিকীয় অ্যামে সিজেয়ার *Discourse on Colonialism* বইয়ে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিতের সম্পর্ক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বিশ্লেষণ করেন। এই দুয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মূলে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক উপসঙ্গগুলো বিদ্যমান তারও একটি জটিল ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন অ্যামে সিজেয়ার তাঁর এই বইয়ে।

আসলে আফ্রিকী লেখক-সাহিত্যিকগণ পশ্চিমা রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিকার প্রকৃত পরিচয়ই উদঘাটন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এ কথার সত্যতা পাওয়া যায় চিনুয়া আচেবের মনোভাবেও। তিনি মনে করেন, তিনি লেখেন আফ্রিকার সংস্কৃতির সঠিক চিত্র অংকন করার জন্য যাকে পশ্চিমারা বিকৃত করেছে। এক সাক্ষাৎকারে আচেবে বলেন :

I was introduced to the danger of not having your own stories. There is that great proverb – that until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter .... Once I realized that, I had to be a writer. I had to be that historian. It's not one man's job. It's not one person's job. But it is something we have to do, so that the story of the hunt will also reflect the agony, the travail, the bravery, even, of the lions.

অর্থাৎ আফ্রিকাকে শুধুই ইউরোপের চোখ দিয়ে দেখলে এর সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। আফ্রিকাকে আফ্রিকার চোখে দেখতে হবে। এই বাইনারী অপজিশান উপস্থাপনের কাজ আচেবের মত সব দায়িত্বশীল লেখকই করেন এবং করে যাচ্ছেন।

আসলে উত্তর-ঔপনিবেশিককালে যেসব আফ্রিকী লেখক বিশ্বদরবারে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের অনবদ্য লেখনির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, আফ্রিকা পশ্চিমাদের বর্ণবাদী ধারণাপ্রসূত ইতিহাসের উপাদান নয়। এটি তাদের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক যুক্তিতর্ক প্রতিষ্ঠার উপকরণও নয়। আফ্রিকা নিজেই এক অনবদ্য ইতিহাস এবং এর আছে নিজস্ব সমৃদ্ধ, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও নান্দনিক সৌন্দর্য। এর সাহিত্য ও রাজনীতি একে অন্যের থেকে আলাদা নয়। এরা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই সত্য উদঘাটনের জন্য বাহির থেকে শুধু পর্যটক বা ব্যবসায়ী বা পরিভ্রমক বা দাদাগিরির আত্মপ্রসাদে আচ্ছন্ন কোন শাসকের দৃষ্টিতে আফ্রিকাকে দেখলে চলবে না। এর জন্য দরকার আফ্রিকার অন্তরে প্রবেশ করা, এর কণ্ঠকে নিজের কণ্ঠে ধারণ করা ও একজন দায়িত্ববান শিল্পীর নৈর্স্যগিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যার অনুপস্থিতিতে যা পাওয়া যাবে তা হলো আফ্রিকার ক্যারিকেচার, আফ্রিকা নয়। আর ঔপনিবেশিকরা আফ্রিকাতে তাঁদের নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি আমদানীর জন্য এবং স্থানীয়দের তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখতেই

পারেন। কিন্তু এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আফ্রিকার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ভাবনাকে accommodate নয় বরং দমন-পীড়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে eliminate বা বিলোপ করতে চেয়েছে, তার জন্য আমরা তাদের সমালোচনা করতেই পারি। এই কাজ শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। বাংলাদেশের বোদ্ধা-সমাজও বসে নেই। এখানে আফ্রিকী সাহিত্যের বাংলা ভাষান্তর ও সমালোচনায় যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁদের মধ্যে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, শামসুজ্জামান খাঁন, ড. নূরুল ইসলাম, প্রয়াত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।